দৈনিক
আমাদের সময়

ড. মো. শরিফ উদ্দিন

শিক্ষার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকতে হবে

শিক্ষা ব্যক্তিমানুষ, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নতির প্রথম এবং প্রধান সোপান। এই উন্নতি শুধু আর্থ-সামাজিক উন্নতিই নয়, বরং মানবিক উন্নয়নও শিক্ষার বড় দিক। আমরা জেনে এসেছি, শিক্ষিত সমাজ মানে মানবিক সমাজ, সে মানুষে মানুষে হানাহানি কম, মমত্ববোধ বেশি, ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ববোধও বেশি। অর্থাৎ এখান থেকে যদি আমরা শিক্ষার উদ্দেশ্য তালাশ করতে যাই তবে দেখ যায়, শিক্ষা মানুষকে মানবিক, চারিত্রিক দিক থেকে উন্নত এবং আলোকিত করে তোলে, সমানতালে উন্নতি ঘটে ঘরে-বাইরে। এ জন্যই শিক্ষা নিয়ে আমাদের এত উচ্ছ্বাস, কারণ সভ্যতার আলো আমাদের ঘরে এসেছে শিক্ষার হাত ধরে। অজ্ঞতার অন্ধকার, যে অন্ধকারে সূর্যের আলো পৌঁছে না, সেই কালো দূর করতে পারে কেবল শিক্ষাই।

আধুনিক যুগে এসে এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই যে, শিক্ষা আমাদের উন্নত করতে ভূমিকা রেখে চলেছে, কিন্তু একুশ শতকে এসে যে প্রশ্নটি সামনে এসে দাঁড়িয়েছে একই সঙ্গে পৃথিবী এবং বাংলাদেশের সামনে, সেটি হলো শিক্ষার উন্নতিকল্পে আমরা কী করছি? কী-ই বা করার রয়েছে আমাদের? শিক্ষা নিয়ে অনেক কথা বলেছেন আমাদের সমাজের পণ্ডিতজন। এই তালিকায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে আজকের অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ রয়েছেন। আমরা কী ধরনের শিক্ষা চাই, আমাদের শিক্ষা কেমন হওয়া উচিত, আমাদের শিক্ষায় কী কী ঘাটতি রয়েছে– এ নিয়ে বিস্তর আলোচনা অনেকদিন ধরেই শুনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি আমরা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আক্ষেপ করেছেন আমাদের শিক্ষায় আনন্দ নেই বলে; একদিকে আমাদের শিক্ষা যেমন নীরস তেমনি শ্রমসাধ্য। আর এ কথা সত্য যে, যে কোনো কাজের ক্ষেত্রেই এ কথা খাটে– যেখানে আনন্দ নেই সেখানেই কষ্টকে কষ্ট মনে হয়, আনন্দ থাকলে সে কাজের ভেতরে কষ্টের কোনো বালাই নেই।

ছেলেবেলা থেকেই একজন শিশু শিখে আসছে পড়ালেখা মানে খুব ভোরে অনেকগুলো বই কাঁধে নিয়ে বিদ্যালয়ে যাওয়া, সারাদিন হাঁফ ছাড়ারও উপায় নেই, বিকালে খেলাধুলার ফুরসত নেই, প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়ার চাপ, এর পর আবার হোমওয়ার্ক। এগুলো হলো একজন শিশুর রুটিনওয়ার্ক, নয়তো বাবা-মা আতঙ্কে থাকেন এই বুঝি তাদের সন্তান অন্যদের থেকে পিছিয়ে পড়বে। অর্থাৎ সর্বত্র আমরা এক অসুস্থ প্রতিযোগিতার ভেতর দিয়ে প্রতিনিয়ত নিজেদের নিয়ে যাচ্ছি। আর এই কুপ্রভাব থেকে বাইরে রাখছি না শিশুদেরও। আমাদের শিশুরা মানবিক মানুষ হওয়ার জন্য কী শিখছে না শিখছে এসব নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই, এই ধারা অব্যাহত রয়েছে প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পর্যন্ত, ইদানীং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও এই রোগ সংক্রমিত হচ্ছে।

আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার কথাই যদি ধরা হয় দেখা যাবে, ধীরে ধীরে সিলেবাস কত দুর্বোধ্য হয়েছে, কী সব অপ্রয়োজনীয় বিষয় ঢুকে গেছে পাঠ্যবইয়ে– ভাবতে অবাক লাগে, শিশুদের বইয়ে এবার যুক্ত করা হয়েছে 'অ'-তে অজ। অজ অর্থ কী? উত্তর হলো, ছাগল। কী দরকার ছিল যে শিশুদের অ, আ পরিচিত করাতে গিয়ে অজগর, আমের মতো পরিচিত বিষয় বাদ দিয়ে অজকে টেনে নিয়ে এলাম? এর উত্তর কেউ জানে না, স্বয়ং শিক্ষাসংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানে না কীভাবে শিশুদের বইয়ে এসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়। সামাজিক গণমাধ্যমে তুমুল হইচই হলে কর্তৃপক্ষ এগুলো বদলানোর কথা বললে, এর পর হাজারো ভুল-ভ্রান্তি তো রয়েছেই, কেউ কেউ বললেন, আঠা দিয়ে ওইসব ঢেকে দেবেন! খুবই হাস্যকর এসব হঠকারিতা, শাক দিয়ে কখনো মাছ ঢাকা যায়! এসব ঘটনা এবারই যদি প্রথম ঘটত তবে এসব নিয়ে হয়তো কথা বলার প্রয়োজনই হতো না। আমরা ধরে নিতাম, পরের বছর এ ভুল আর হবে না, ভুল যা হয়েছে সংশোধন করে নেওয়া হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, প্রতিবছরই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে। আমাদের জানা নেই, এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন অবস্থা পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে বিরাজ করছে কিনা– যেখানে শিক্ষার মান কোনো বিষয় নয় বরং পাসের হার কত, জিপিএ-৫ কত হাজার ছাড়াল– এসব নিয়ে হইচই করেই ক্ষান্ত দেয় কর্তৃপক্ষ। শিক্ষার মান যে নিচে নামছে, শিক্ষায় যে ক্রম-অধঃপতন শুরু হয়ে গেছে এ কথা নিশ্চয়ই কোনো শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ অস্বীকার করবেন না। পৃথিবীতে এমন দেশ কোথায় আছে, যেখানে পরীক্ষার আগের রাতে শিশুদের হাতে ফেসবুক-হোয়াটস অ্যাপের বদৌলতে প্রশ্ন পৌঁছে যায়! কী জঘন্য এবং আত্মঘাতী পথে হাঁটছি আমরা! এটিও যেন আরেকটি ভয়াবহ জঙ্গিবাদী সংঘবদ্ধ চক্র, যারা পরিকল্পিতভাবে উঠতি বয়সী তরুণ মেধাবীদের বিপথগামী করে দেশকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে চায়। আমরা যদি আন্তরিক হতাম তবে পাসের হার, জিপিএ-৫ এর মতো বিষয় ছেড়ে আগে এই সমস্যার বিরুদ্ধে সর্বজনীন যুদ্ধ ঘোষণা করতাম। অথচ দুঃখের বিষয় হলো, সরকারি মহল থেকে এতদিন স্বীকারই করা হয়নি যে প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে, সম্প্রতি শিক্ষামন্ত্রী প্রকাশ্যে একটি চক্রের জড়িত থাকার কথা বলেছেন। তবু আমরা

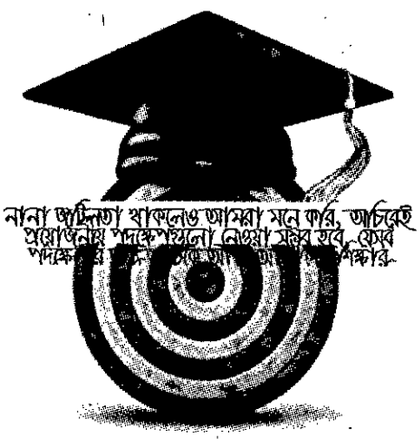

এই ভেবে আনন্দিত হয়েছি যে, অন্তত এবার তিনি এই দুরবস্থার কথা স্বীকার করলেন! আমাদের অবস্থা এখন এমন যে, শরীরের ভেতরে ঘাতক ব্যাধি বয়ে বেড়াচ্ছি অথচ স্বীকার করছি না যে অসুখ হয়েছে। যেন অন্ধ হলেই প্রলয় বন্ধ হয়ে যাবে।

এক সময় ছিল নকলের ছড়াছড়ি, সবাই ভাবলেন নকল বন্ধ হলে বুঝি রক্ষা, এখন এমন বিষবাষ্প ছড়িয়ে পড়েছে যে নকলের আর প্রয়োজন নেই। যাহোক শিক্ষার উন্নতিকল্পে পদক্ষেপ নিতেই হবে আমাদের, বন্ধ করতে হবে ঘন ঘন সিলেবাস পরিবর্তন। দায়িত্বজ্ঞানহীনতাও বন্ধ করতে হবে।' গত ১৮ মার্চের একটি জাতীয় দৈনিকে লিখেছে, আড়াই মাসেও পাঠ্যসূচি বা সিলেবাস পায়নি শিক্ষার্থীরা। পত্রিকাটি বলছে, "নবম-দশম শ্রেণির বাংলা সাহিত্য বইয়ে ৩০টি গদ্য এবং ৩১টি কবিতা আছে। এর মধ্যে ১৫টি গদ্য এবং ১৫টি কবিতা নবম শ্রেণিতে পড়ানোর জন্য পাঠ্যসূচি দিয়ে থাকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। সেই পাঠ্যসূচি এখনো না পাওয়ায় বিদ্যালয়গুলোয় শিক্ষকরা 'আন্দাজের' ওপর ভর করে গদ্য, কবিতা পড়াচ্ছেন।"

উল্লেখিত সংবাদের দিকে তাকালেই আমাদের কর্তৃপক্ষের আন্তরিকতার মাত্রা কোন তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে তা সহজেই অনুমেয়।

এ কথা ঠিক যে, সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বাংলাদেশ সামাজিক উন্নয়নের কিছু সূচকে ভালো করেছে, এই ভালোর কথা ভেবে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে আহ্লাদে ব্যাকুল হওয়ার মতো কোনো কারণ নেই, আমাদের অনেক পথ এখনো সামনে বাকি। স্যানিটেশন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং নারী ও পুরুষের মাঝে ব্যবধান কমিয়ে এনে আমরা দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশ এমনকি ভারতের চেয়েও এগিয়ে রয়েছি কিন্তু একই সঙ্গে এ কথা সত্য যে, আমাদের সমাজে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতে যে অগ্রগতি হওয়ার কথা ছিল সেটি এখনো সুদূরপরাহত। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় অন্তর্ভুক্তিমূলক, ন্যায্যতাপূর্ণ, জীবনব্যাপী মানসম্মত শিক্ষার ওপর যে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সে বিষয়ে আমরা এখনো অনেক পিছিয়ে রয়েছি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আগের তুলনায় এখন অনেক শিক্ষার্থী বেড়েছে এবং অনেক শিক্ষার্থী কিন্তু বিদ্যালয়ের বাইরেও অবস্থান করছে, অনেকে ঝরে পড়ছে। সরকারি হিসেবেই প্রায় ২১ শতাংশ শিক্ষার্থী প্রাথমিকেই ঝরে পড়ে।

যাহোক শিক্ষার মান ও পরিসর বৃদ্ধি এবং শিক্ষাকে সমৃদ্ধ করার বিভিন্ন উদ্যোগের কথা সম্প্রতি পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেছেন। তিনি বিদ্যালয়ে দুপুরের খাবার সরবরাহে সরকারের পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন। এ ধরনের উদ্যোগ শিশুদের বিশেষত পিছিয়ে থাকা অঞ্চলের শিশুদের বিদ্যালয়মুখী করতে ভূমিকা রাখতে পারে। শেষ কথা হলো, শিক্ষার উন্নয়নে আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোর কাছ থেকে শিক্ষা নিতে হবে। উদাহরণ হিসেবে আমরা শ্রীলংকা ও ভারতের কথা বলতে পারি। ভারতের কাছ থেকে যে বিষয়টিকে আমরা শিক্ষা নিতে পারি সেটি হলো, আমাদের বিশাল জনগোষ্ঠীকে দক্ষ করে গড়ে তোলা। শুধু গতানুগতিক শিক্ষা এ ক্ষেত্রে বেশি ফলপ্রসূ হবে না। আমাদের যোগাযোগ ও প্রযুক্তিতে দক্ষ জনবল তৈরির দিকে মন দিতে হবে। বিদেশে শুধু শ্রমিক পাঠানোর চিন্তা কমিয়ে ফেলে প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের বড়কর্তা হিসেবে বিদেশে পাঠানোর সময় এসেছে। এ জন্য ছেলেমেয়েদের বিজ্ঞানমনস্ক করে গড়ে তুলতে হবে এবং বিজ্ঞানের প্রতি ঝোঁক যেন বৃদ্ধি পায় সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। ইদানীং শিক্ষার্থীদের মাঝে বিজ্ঞান বিষয়ে পড়ার আগ্রহ দিন দিন কমে যাচ্ছে। এর কারণ অনুসন্ধান করে যথাযথ ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে।

অন্যদিকে শ্রীলংকার দিকে তাকালে দেখা যায়, ২০১৫ সালের পরিসংখ্যানমতে দেশটির শিক্ষার হার প্রায় ৯৩ শতাংশ, প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত করে তারা শিক্ষার পরিসর এবং গুণগত মানকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে পেরেছে বলেই দক্ষিণ এশিয়ায়ই তারা এখন দ্যুতি ছড়াতে পারছে। মাধ্যমিকের পরই তারা কারিগরি শিক্ষাকে আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করতে পেরেছে সেখানে। এটি শুধু শ্রীলংকায় নয়, বরং চীনের দিকে তাকালে অবাক না হয়ে পারা যায় না, তাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বেকার তৈরি করছে না, বরং কর্মমুখী শিক্ষায় আলোকিত হয়ে তারা পৃথিবীকে অবাক করে দিয়েছে।

নানা জটিলতা থাকলেও আমরা মনে করি, অচিরেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো নেওয়া সম্ভব হবে, যেসব পদক্ষেপের জন্য আটকে আছে আমাদের শিক্ষার সামগ্রিক অগ্রগতি। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাও একদিন আলো ছড়াবে দেশে-বিদেশে, আমাদের কোনো শিশুই থাকবে না বিদ্যালয়বিমুখ, শিক্ষার আলোয় উন্মুক্ত হবে মানবিক ও বৈষয়িক মুক্তির দ্বার।

❑ ড. মো. শরিফ উদ্দিন : অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়